জলের চাহিদা মেটাতে বৃষ্টির জল ব্যবহার — একাল ও সেকাল

রাহুল রায়*

বিকাশ বা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত এবং উৎস হল জল। অতীতে বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলোই ছিল মানুষের ব্যবহার্য জলের প্রধান উৎস। আর নদী থেকে দূরে যে সব মানুষ বাস করত, তারা মাটির নীচের জল বা ভৌমজল (ground water) ব্যবহার করত। তাদের বেঁচে থাকার জন্য বৃষ্টির জল ধরে রাখত। ভারতবর্ষে ভৌমজলের ব্যবহার বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। ব্যক্তি মানুষ, চাষি অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ঘর-গেরস্তালির কাজে এবং চাষের জমিতে জলসেচ করতে খোলা কুয়োর (open wells) ভৌমজল ব্যবহার করেছে। কুয়োর জল চাষের জমিতে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় বেশ কয়েক শতাব্দ ধরেই। জলসেচের কাজে বড় পুকুর বা জলাধার (tank) এবং খাল (canal) এর জল কম পাওয়ায় চাষিরা বহুদিন ধরেই এই কুয়োর জল ফসল ক্ষেতে সেচের কাজে দেয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, এরকম জলসেচের পেছনে কোন পরিকল্পনাই নেই। প্রতিটি অঞ্চলেই জলের চাহিদা মেটানো হয়েছে অন্য জায়গার কথা না ভেবে।

ভৌমজল ও ভূপৃষ্ঠের জল (surface water) আলাদা কিছু না। পৃথিবীতে পাওয়া মোট মিঠা জলের এরা দুটি রকম মাত্র। ভূপৃষ্ঠের ওপর বয়ে যাওয়া জলের, যা প্রধানত আসে বৃষ্টিপাত থেকে, অনেকটাই নোনা সমুদ্রে গিয়ে মেশে। মানুষ তার রোজকার নানান কাজে এবং চাষের জমিতে জলসেচ করতে ক্রমাগত ভৌমজল ব্যবহার করে চলেছে। এতে ভৌমজলস্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে বহু অগভীর কুয়ো শুকিয়ে আসছে, জলের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে, সমুদ্রের উপকূলে ভৌমজলস্তরে নুনের পরিমাণ বাড়ছে। এই সমস্যা কাটাতে চাষের কাজে তখন বেশি শক্তিশালী পাম্প বসিয়ে মাটির অনেক নীচে থেকে জল টেনে তোলার খরচও বেশি পড়ছে। গরিব চাষিদের পক্ষে এই খরচ সামলানো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্ত কিছু দেখেই 'ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউট'

---

* গবেষক ও পরিবেশকর্মী

জানিয়েছে যে, আগামী পাঁচ বছরের (২০২৫ সাল) মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশই নানান দেশে চরম জলকষ্টের মধ্যে পড়বে।

ভারতের জলচিত্র

বর্তমানে ভারতবর্ষ বেশ ভালরকম জলসংকটে ভুগছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের চাহিদা এখনও মেটানো যায়নি। নির্মল জলের সমস্ত উৎসগুলোই হয় অতি জল উত্তোলনে বিপন্ন, নয়তো ভয়ানক দূষিত। সঙ্গে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও। এমন কোন নদী বা শহরের কাছাকাছি ভৌমজলস্তর খুঁজে পাওয়া ভার, যা দূষণমুক্ত। একদিকে যেমন অনেক জায়গায় চাষের জমি সেচের জল পাচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনই হাজার হাজার গ্রামের মানুষের নির্মল পানীয় জল জোগাড় করা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। উনিশ শতাব্দ থেকেই পৃথিবীতে জল-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, জল সরবরাহকারী হিসেবে রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। আগে, প্রয়োজনীয় জলের জোগানের ব্যবস্থা গেরস্ত এবং মানব গোষ্ঠী নিজেরাই করত। দ্বিতীয়ত, ভৌমজল এবং ভূপৃষ্ঠের ওপরের জলের ওপর নির্ভরতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আগের মতো বৃষ্টির জল বা বন্যার সময়ের অতিরিক্ত জল ধরে রেখে ব্যবহারের ঝোঁকটি অত্যন্ত কমে গেছে। যদিও ভূগর্ভস্থ জল বা নদীর জলের তুলনায় বৃষ্টির জল বা বন্যার জলের লভ্যতা অনেক বেশি। ভারতবর্ষে এমন বহু নদী রয়েছে, যার জল মানুষ এমন যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে যে, গ্রীষ্মকালে তাতে কোন জল থাকে না। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ (ecological flow) বজায় রাখতে কেন্দ্র সরকার নদীর জলপ্রবাহের ন্যূনতম সীমা বেঁধে দেয় ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে। আর একটি বড় সমস্যা হল, জল সংরক্ষণের দেশি ছোট পদ্ধতিগুলোকে আমল না দিয়ে নদীতে বড় আকারের বাঁধ দিয়ে তাকে শাসন করা।

ভারত সরকারের 'জল শক্তি' মন্ত্রকের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'কেন্দ্রীয় জল কমিশন' (Central Water Commission) ২০১৯ সালের জুন মাসে এক প্রতিবেদন বের করে। এই প্রতিবেদনে ভারতে মিঠা জল লভ্যতার এক পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ভারতের সম্ভাব্য বা কার্যকরী জল সম্পদের হিসেবের জন্য ৩২৩৪৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার এক অঞ্চল জুড়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছিল। সিন্ধু নদের সীমানার ওপরের অঞ্চল, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই ক্ষেত্রসমীক্ষার বাইরে ছিল। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের প্রধান নদী অববাহিকাগুলোতে বিগত তিরিশ বছরের (১৯৮৫-২০১৫) হিসেবে গড় বার্ষিক জল সম্পদের পরিমাণ ১৯৯৯.২০ বিলিয়ন ঘন মিটার। এই একই হিসেবে এই অববাহিকাগুলোতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮৮০ বিলিয়ন ঘন মিটার। এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সমীক্ষিত ৩২৩৪৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে, ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১০৫ মিলিমিটার।

কেন্দ্রীয় জল কমিশনের প্রতিবেদনে (২০১৯) ভারতে মাথা পিছু জলপ্রাপ্তির এক তথ্য

পাওয়া যায়।

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথা পিছু জলপ্রাপ্তি (ঘন মিটার/বছর)	মন্তব্য
১৯৫১	৩৬১	৫১৭৮	
১৯৫৫	৩৯৫	৪৭৩২	
১৯৯১	৮৪৬	২২১০	
২০০১	১০২৭	১৮২০	
২০১৫	১২১১	১৬৫১	জলের ঘাটতি
২০২১	১৩২৬	১৫০৮	জলের ঘাটতি
২০৩১	১৩৪৫	১৪৮৬	জলের ঘাটতি
২০৪৯	১৫৬০	১২৮২	জলের ঘাটতি
২০৫১	১৬২৮	১২২৮	জলের ঘাটতি

আলোচ্য সারণিতে ২০২১ থেকে ২০৫১ সাল অব্দি জনসংখ্যার হিসেবটি ভারতের পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) এর কল্পিত (projected)। ২০১৫ থেকে ২০৫১ সাল অব্দি মাথা পিছু বার্ষিক জলপ্রাপ্তির হিসেবটি কষা হয়েছে জলসম্পদ মুল্যায়ন (WRA = Water Resource Assessment) এর ২০১৭ সালের তথ্যের ভিত্তিতে। এখানে উল্লেখ্য, 'Falkenmark জলঘাটতি সূচক' অনুযায়ী, মাথা পিছু বার্ষিক জলপ্রাপ্তির পরিমাণ ১৭০০ ঘন মিটারের কম হলে, তাকে বলে 'জল-ঘাটতি' (water stressed); আর এই জলপ্রাপ্তির পরিমাণটি যখন মাথা পিছু ১০০০ ঘন মিটারের কম হয়, তাকে বলে 'জল সংকট' (water scarcity)।

কেন্দ্রীয় জল কমিশন সমীক্ষিত অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সন্তোষজনক হলেও দেখা যাচ্ছে যে, মাথা পিছু জলপ্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমশই কমছে। ফলে জলের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। সার্বিক ভাবে বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার করা শুরু করতে না পারলে কিছুতেই ভৌমজল ও ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমানো যাবে না। এখানে একটি বিষয় অবশ্যই বলার যে, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর আর্দ্রতম স্থান। এখানে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ মিলিমিটার। শুনতে অবাক লাগলেও এখানে পানীয় জল সংকট রয়েছে। কারণ বৃষ্টিপাতের প্রায় পুরোটাই হয় প্রবল বর্ষায়। ভূমির ঢাল বেয়ে জলনিকাশও (run off) ঘটে তাড়াতাড়ি। বছরের শুকনো মাসগুলোর জন্য বৃষ্টির জল ধরে রাখার কোন সুযোগ থাকে না। আবার খাতায়-কলমে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে বছরে যত পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তা যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে সেটি প্রতিটি ভারতবাসীর নির্মল পানীয় এবং রান্নার জলের চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কী জিনিস? ইতিহাসে কি এর খোঁজ মেলে? বৃষ্টির জল যেখানে পড়বে, সেখানেই তাকে ধরে রাখতে হবে। একেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বলে। বাড়ির ছাদে

বৃষ্টির যে জল পড়ে, এটা তাকেও ধরে রাখাও বলে, আবার ভূপৃষ্ঠে যে বৃষ্টির জল পড়ে, তাকে ধরে রাখ বলে। এর মোদ্দা কথাটি হল প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটাকে মুল্য দেওয়া। বৃষ্টির জল যেখানে ধরে রাখা হচ্ছে, সেটি যাতে নির্মল,দূষণমুক্ত থাকে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ মুলত মানুষ-বৃষ্টি-ভূমির এক চমৎকার ঐকতান। বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের প্রথাটি ইতিহাস-প্রাচীন। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বৃষ্টির জল ব্যবহারের নজির রয়েছে।

প্রথমে ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক। এ দেশে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ ঘটে বর্ষাকালে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে। এই বৃষ্টিপাতের ৫০ শতাংশ ঘটে প্রায় ১০০ ঘন্টা সময়ে দিন পনেরোর মধ্যে (ঘড়ির হিসেবে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের সময় ৮৭৬০ ঘন্টা)। বছরের বাকি সময়টা থাকে বৃষ্টিহীন। ভারতবাসীরা তাই এটা ভাল করেই জানে যে, যেখানে বৃষ্টি পড়ছে, সেখানেই তাকে ধরে রাখতে না পারলে, পরে চাতক পাখি হয়েই থাকতে হবে। এ জন্যই তারা গড়ে তুলেছিল বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল এক জীবনযাত্রা; সভ্যতা। দেশে এর অসংখ্য নজির রয়েছে।

ভারতবর্ষের জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা — ফিরে দেখা

বহুকাল আগে থেকেই নানান উপায়ে ভারতীয়রা বৃষ্টির জল ধরে রাখত। গুজরাটে কচ্ছ জেলার ভাচাউ তালুকের খাদিরবেট-এ ধোলাভিরা অঞ্চল খুঁড়ে জানা গেছে যে, হরপ্পা সভ্যতার যুগেও মানুষ বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি জানত। ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আমলে পাহাড়বাসী সাধুরা বর্তমান মুম্বাই এর এলিফ্যান্টা গুহার পাথরের দেওয়ালের গায়ে গর্ত করে সারি সারি ছোট চৌবাচ্চা বানিয়েছিল। ওড়িশার রাজা খারবেল জৈন সাধুদের থাকার জন্য উদয়গিরির পাহাড় কেটে যে গুহা বানিয়েছিলেন, তার পাথরের দেওয়ালের গায়ে বড় গর্ত করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। ওড়িশার চন্দ্রগিরি পাহাড়েও এই একই জিনিস দেখা গেছে। এসব গুহার ছাদে বৃষ্টির যে জল পড়ত, তা গুহার ছাদ থেকে পাতলা ধাতুর তৈরি সরু নালি দিয়ে গুহার গর্তে বা চৌবাচ্চায় এসে জমত। এই জলে সাধুদের সারা বছরের জলের চাহিদা মিটত। সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দে চোল এবং পাণ্ড্য রাজারা পাহাড়ের পাদদেশে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য বড় জলাধার বানিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে মাদুরাই-এ এক মন্দিরে বেশ কয়েকটি বিশাল বড় জলাধার রয়েছে। ঐই জলাধারে বৃষ্টির জল ধরা হত। আশেপাশের মানুষ এই জলাধার থেকে তাদের ঘর-গেরস্তালির জলের চাহিদা মেটাত। প্রাচীনকালে তামিলনাড়ু-তে (বর্তমান চেন্নাই) মানুষ নানান কাজের জন্য, যেমন — পানীয়, স্নান, ঘরের কাজ ইত্যাদি, আলাদা করে জল পুকুর বা জলাধারে (tank) ধরে রেখে দিত। দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু মন্দির আছে, যাদের পাথরের দেওয়ালের গায়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কথা খোদিত রয়েছে। এসব শিলালিপি থেকে জলাধারের নানান তথ্য, যেমন — জল ব্যবস্থাপনা এবং জলাধারের সংস্কার সম্পর্কীয় তথ্য পাওয়া যায়। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে বর্তমান চেন্নাই এর রামানাথপুরম জেলায় শতাব্দ-প্রাচীন বেশ কিছু অতি ভাঙাচোরা জলাধারের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজাদের আমলে

(১৩৩৬-১৬১৪ খ্রিস্টাব্দ) অনেক জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। এই জলাধারে মূলত চাষের কাজে জলসেচ করার জন্য জল ধরে রাখা হত। ব্রিটিশ প্রশাসক স্যার টমাস মুনরো-র (মাদ্রাজ এর গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮২০ সালের মে মাসে) লেখায় এই জলাধারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত রাজস্থানে বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার নানান পদ্ধতি দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দে মেওয়ার রাজত্বে রাজস্থানের চিতোর-এ আরাবল্লি পাহাড়ের ওপরে গড়ে ওঠে চিতোর দুর্গ। এখানে না আছে কোন নদী, না পাওয়া যায় ভৌমজল। তাহলে জলের চাহিদা মিটত কীভাবে? দুর্গটি বানানোর সময়ে প্রচুর জলাধার তৈরি করা হয়েছিল বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। তাই হাজার পঞ্চাশেক সেনা কোনওরকম জলকষ্ট ছাড়াই এখানে বছরের পর বছর কাটিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৮৭ সালে বর্তমান চিতোর শহরে ভয়ানক জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত চিতোর দুর্গে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি।

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, অতীতে ভারতবর্ষে রাজারা কদাচিৎ নিজেরা জলাধার বানিয়ে দিতেন বা জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। বদলে আর্থিক সাহায্য করে জনসাধারণকে জল সংরক্ষণের নানাপ্রকার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন। রাজারা বিভিন্ন নামে আর্থিক সহায়তা করতেন, যেমন — 'দশবন্ধিনী ইনাম', 'দশবন্ধ', 'কাতু কোদাজ' ইত্যাদি। বিজয়নগরের রাজারা এই সমস্ত আর্থিক সাহায্য করে মানুষকে জলাধার তৈরিতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। মধ্যভারতে গণ্ড রাজারাও এ ধরণের আর্থিক সহায়তা করে মানুষকে জল সংরক্ষণের জন্য সুচারু পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ও তার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিতেন। জল সংরক্ষণে মানুষকে উৎসাহিত করতে আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত ও চুক্তির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, রাজারা অনেক সময়েই নানান মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে তা খোদাই করে লিখে রাখতেন। এসব লেখা থেকে সাধারণ মানুষ জানতে পারত যে, কোন্ কোন্ অঞ্চল বা গ্রামের জন্য কে কে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এতে, জল সংরক্ষণের কাজের জন্য যারা আর্থিক সাহায্য পেত রাজাদের কাছ থেকে, তাদের ওপর তা গড়ে তোলার এক সামাজিক চাপ থাকত। সে ব্যর্থ হলে বা না করলে, মানুষ রাজাকে জানাত। ভাবলে বিস্ময় জাগে, বর্তমান সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো অতীতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে কী সুন্দর চালু ছিল।

মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল উত্তরপ্রদেশ এর সাতটি এবং মধ্যপ্রদেশ এর ছয়টি জেলা নিয়ে গঠিত। অঞ্চলটি খরাপ্রবণ। নবম শতাব্দ থেকে এখানে জল সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে। চান্দেলা রাজবংশ বুন্দেলখণ্ডে ৮৩১ থেকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ অব্দি রাজত্ব করেছে। ইতিহাসের নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রায় প্রতিজন রাজাই জল সংরক্ষণের জন্য নানান মাপের জলাধার বানিয়েছিলেন। চান্দেলা রাজবংশের চতুর্থ রাজা রাহিলা (রাজত্বকাল ৮৮৫-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) মাহোবা-র কাছে 'রাহিলাসাগর' নামে এক বড় জলাধার গড়িয়েছিলেন। খাজুরাহো শিলালিপি (১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা গেছে, খাজুরাহো গ্রামের চারিপাশে রাজা যশো বর্মণ (রাজত্বকাল ৯২৫-৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) বেশ কিছু বড় পুকুর খুঁড়িয়েছিলেন।

বর্ষার জল এখানে ধরে রাখা হত। রাজা কীর্তি বর্মণ (রাজত্বকাল ১০৬০-১১০০ খ্রিস্টাব্দ) মাহোবা ও চান্দেরি-তে 'কীর্তিসাগর' নামে এবং 'বুধিয়াতাল' নামে কালানইয়ারা-তে জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাজা মদন বর্মণ (রাজত্বকাল ১১২৮-১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ) অনেকগুলো জলাধার তৈরি করান, যেমন — 'মদনসাগর' নামে টিকমগড় জেলার নারায়ণপুরা-র আঘারা ও জাতারা-তে দুটি বড় জলাশয় এবং ওই একই নামে নিজের রাজবাড়ি থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে আর একটি জলাধার। রাজা মদন বর্মণ এর প্রধানমন্ত্রী গদাধর দেড্ডু গ্রামের সীমানায় গাঁথুনি দিয়ে একটি বড় জলাধার গড়িয়েছিলেন। রাজা পার্মারদিদেবা (রাজত্বকাল ১২৪৫-১২৮৫ খ্রিস্টাব্দ) অজয়গড় নামক স্থানে 'পারমালা' জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। রাজা বীর বর্মণ (রাজত্বকাল ১২৪৫-১২৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এর পত্নী কল্যাণীদেবী অজয়গড়ে একটি জলাধার তৈরি করান। এখানে তিনি একটি কুয়োও খুঁড়িয়েছিলেন। অজয়গড়ে প্রাপ্ত স্তম্ভ ও দেওয়াল লিপি (epigraph) থেকে জানা যায় যে, কল্যাণীদেবী এখানে যে জলাধারটি তৈরি করিয়েছিলেন, সেটি সমুদ্রের মতো বিশাল বড় ছিল। 'কলিঞ্জর' শিলালিপি জানাচ্ছে যে, রাজা বীর বর্মণও পুকুর কাটিয়েছিলেন এবং জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। রাজা 'দশরাজ' 'শাণ্ডিল্যতাল' নামে এক বড় জলাশয় তৈরি করিয়েছিলেন। চান্দেলা রাজত্বে বুন্দেলখণ্ডের প্রতিটি গ্রামে জলাধার তৈরি করানো হয়েছিল। এখনও এমন অনেক জলাধার রয়েছে, যাদের ইতিহাস জানা যায়নি।

চান্দেলা রাজা পার্মারদিদেবা-র মৃত্যুর (১২০২ খ্রিস্টাব্দ) পর বুন্দেলা রাজবংশের রাজত্ব শুরু হয়। বুন্দেলা রাজারাও তাঁদের রাজত্বে অনেকগুলো জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। আগের রাজত্বকালের বেশ কিছু জলাধারের সংস্কারও করিয়েছিলেন। রাজা বীরসিংহ দেও-১ 'সিঁদুরসাগর' ও 'বীরসাগর' নামে দুটি জলাধার তৈরি করান। রাজা সুজন সিংহ ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আদজার এর কাছে 'সুজনসাগর' নামে এক জলাধার গড়িয়েছিলেন। বুন্দেলা রাজত্বের পর এই অঞ্চলে ১৭২৯ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহ অব্দি মারাঠা আধিপত্য ছিল। মারাঠি রাজত্বকালে জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয়নি। মারাঠা আধিপত্য অবসানের এটি অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষের তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত ওয়ারাঙ্গাল জেলা। অঞ্চলটি মালভূমি অধ্যুষিত। আজ থেকে প্রায় ১০০ বথর আগে কাকাটিয়া রাজারা ঐতিহাসিক ওয়ারাঙ্গাল নগরের পত্তন করেন। কাকাটিয়া রাজারা প্রথম এই মালভূমি অঞ্চলে চাষের কাজে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এঁরা অনেক জলাধার, জলাশয় এবং ছোট 'কুন্তা' তৈরি করিয়েছিলেন জল সংরক্ষণের জন্য। এ সবের অস্তিত্ব আজও রয়েছে। সমগ্র অঞ্চলে বৃষ্টির জলে পুষ্ট ৩৫০০টি বড় জলাধার এবং ৪২টি মাঝারি আকারের জলাধার আছে। প্রধান দুটি জলাধার হল 'রামাপ্পা' এবং 'পাখাল লাকনাভরম'। কাকাটিয়া রাজারা চেয়েছিলেন প্রতিটি ফোঁটা বৃষ্টির জলকে ধরে রাখতে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর জলবিভাজিকার উচ্চতম অংশকেই রাজারা বেছে নিয়েছিলেন জল সংরক্ষণের প্রধান অঞ্চল হিসেবে। নদী অববাহিকা জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে অনেকগুলো জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। নদীর উচ্চগতির অতিরিক্ত জল এতে ধরে রাখা হত। নদী অববাহিকায় বড় আকারের মাটির বাঁধ দিয়ে জলাধার গড়ে তোলা হয়েছিল। এসব জলাধার

থেকে জল নিতে জলদ্বার (sluice gate) এর ব্যবস্থা ছিল। এ ধরণের জলবাহী পরিকাঠামো ভৌমজলস্তরকেও পুষ্ট করত। কাকাটিয়া রাজারা অনেক মন্দির গড়ে সেখানেও জলাধার তৈরি করান। কোনেরু-তে এরকমই এক মন্দিরের জলাধারের জল আজও মানুষ ব্যবহার করে। মূলত পানীয় এবং চাষের ক্ষেতে জলসেচের কাজে এসব জলাধারের জল ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তির দিক থেকে এই জলাধারগুলো এত উন্নত ছিল যে, এগুলোতে কখনও পলি জমে যাওয়ার (sedimentation) সমস্যা দেখা দেয়নি। এরকমই প্রাচীন দুটি জালধার, 'ভদ্রকালী' এবং 'ওয়াড্ডেপল্লি'-র জল, আজও মানুষ ব্যবহার করে। প্রধানত গ্রীষ্মকালের জলকষ্ট মেটাতে এই জলাধার দুটিতে জল ধরে রাখা হয়। এই জলাধার দুটির জলের প্রধান উৎস 'ধর্মসাগর' জলাধার। পুরানো কাকাটিয়া খাল থেকে পাম্প করে ধর্মসাগর জলাধারে জল ভরা হয়।

রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত উদয়পুর। মহারাজা উদয় সিং ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরকে মেওয়ারের রাজধানী করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য শুরু থেকেই উদয়পুরে জলের ঘাটতি ছিল। মেওয়ার এর অতীত শাসকদের প্রথম কাজটিই ছিল জল সরবরাহের জন্য কৃত্রিম জলাধার বা হ্রদ তৈরি করা। ফলে উদয়পুরে ও তার আশেপাশে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো হ্রদ বা জলাধার, যেমন — ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ছোট মাদর, বড় মাদর, রংসাগর ও কুমারিয়া কা তালাব; স্বরূপসাগর (১৮৪৪), ফতেসাগর (১৬৭৮, পরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এটির সংস্কার করা হয়), গোবর্ধন বিলাস এবং উদয়সাগর। প্রধানত নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এই হ্রদগুলো তৈরি হয়েছিল। এরা একে অন্যের সাথে যুক্ত। কোনও একটি হ্রদের জল উপচে গেলে, তা অন্য হ্রদে গিয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন কোন জল নষ্ট হয় না, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জল শোধিত হয়ে যায়। এই হ্রদগুলোর জলের প্রাথমিক উৎস দুটি নদী — আয়াদ ও সিসামা। শেষে সমস্ত হ্রদের জল গিয়ে মেশে বেদাচ নদীতে। বেদাচ নদী গঙ্গা জলনির্গম প্রণালীর এক অংশ। তাই উদয়পুরের এই হ্রদগুলোর ভারতের জাতীয় নদী-ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর গণ্ড (আঠারো শতাব্দের সূচনায়), ভোঁসলে (১৭৩৯-১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং ব্রিটিশ রাজত্বে ছিল গাছগাছালিতে ভরা এক সবুজ অঞ্চল। নাগপুরের মধ্য দিয়ে সারা বছর বয়ে যেত 'নাগ' ও 'পিলি' এই দুই নদী। এখানে অনেক জলাভূমিও ছিল। আর ছিল দশটি হ্রদ। নাগ নদীর উৎপত্তি 'আমবাজারি' হ্রদ এবং 'তেলাংখেড়ি' জলাধার থেকে। পিলি নদীর উৎস স্থল 'গোরেওয়াদা' হ্রদ। এই দুই নদীর উৎসস্থলই নাগপুর পৌরসভার অন্তর্গত। ভোঁসলেদের আমলে এখানে পুরানো মিলিটারি ছাউনি এলাকায় কালো ব্যাসল্ট পাথরের বেশ কয়েকটি ছোট জলাধার তৈরি হয়েছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য জলাশয়গুলো হল পান্ধারবড়ি (ভিদে), সোনেগাঁও এবং দহেগাঁও।

মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় কোহলি জাতের বাস। কোহলিরা বংশ পরম্পরায় নানান মাপের জলাধার বানাতে অত্যন্ত পটু। ভাণ্ডারা-র অন্তর্গত সাকোলি তহবিল এর বিশাল জলাধারগুলো এদেরই বানানো। মূলত শুখা মরশুমে আখ চাষের ক্ষেতে জলসেচের জন্য এরা বড় জলাধার বানাত। কোথায় এবং কী মাপের জলাধার বানালে আখ চাষে জলের

অভাব মিটবে, সে ব্যাপারে এদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। কোহলিরা প্রায় সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে জলাধার তৈরি করত, যাতে কোন একটি জলাধারের জল উপচে গেলে অন্য জলাধারে জমা হতে পারে। এদের '১৬ আনা মালগুজারি' ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই তাদের ন্যায্য প্রয়োজন মতো জল পেত। একই সঙ্গে জলাধারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও চলত।

ছোটনাগপুর মালভূমির এক বড় অংশ জুড়ে শুখা মরশুমে এবং অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। স্থানীয় ভাবে একে 'জলধর' বলে। চাষিরা তাদের কৃষি ক্ষেতের এক সামান্য অংশ চাষ না করে বৃষ্টির জল ধরতে রেখে দেয়। যেখানে ভূমির ঢাল দুই শতাংশের কম, সেখানে ১.২ মিটার থেকে ১.৫২ মিটার গভীর এক গর্ত খুঁড়ে জল ধরা হয়। ভূমির ঢাল ২-৮ শতাংশের মধ্যে হলে, ১০ মিটার চওড়া ও ৩০ মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে জল ধরা হয়। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি, চাতরা, গোড্ডা, দুমকা, পুর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু অংশে এই 'জলধর' ব্যবস্থাটি দেখা যায়। ভারতের নানান অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে চাষের ও ঘর-গেরস্তালির কাজে এরকম ভাবে বৃষ্টির জল ধরে রাখার চল রয়েছে বিভিন্ন নামে, যেমন — হিমালয়ের উঁচু অঞ্চলে এটি 'ঘুল' নামে পরিচিত, লাদাখ-এ একে বলে 'জিংস', গাড়োয়াল-এ এর মাম 'ঘরত' বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু জায়গায় একে বলা হয় 'আহর', তামিলনাড়ু-তে 'এরিস' এবং রাজস্থানে এর নাম 'জোহর'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে 'সেন্ট্রাল অ্যারিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট' বৃষ্টির জল ধরে রাখায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রায় চার দশক আগে রাজস্থানের 'তরুণ ভারত সংঘ' এখানকার মাতাশ্যা অঞ্চলে এবং আলওয়ার জেলার গোপালপুরা গ্রামে 'জোহর' এর মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে গোটা দেশের নজর কাড়ে। বর্তমানে ভারতবর্ষে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে বৃষ্টির জল ধরে রাখার কাজটি শুরু হয়েছে। এই মিতায়তন রচনায় আপাতত সে আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

পৃথিবীর অন্যত্র বৃষ্টির জল সংরক্ষণ — ফিরে দেখা

বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের ইতিহাস বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের আসার দিন থেকে শুরু হয়েছে। ইজরায়েল এর মরুপ্রায় অঞ্চলে এবং নেগেভ মরুভূমিতে বিগত প্রায় চার হাজার বছর ধরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়। এখানে বছরে ১৫০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টি হয়। ফসল ক্ষেতে জলসেচের জন্য, পাহাড়ি অঞ্চল পরিষ্কার করে জলনিকাশ বাড়ানো হয় এবং সমোন্নতি রেখা বরাবর পরিখা বা খাত কেটে (contour ditches) বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। এভাবে মাটির গর্তে এখানকার মানুষ প্রায় ৩০০ ঘন মিটার অব্দি জল ধরে রাখে। এই পরিমাণ জল দশটি পরিবারের সকল সদস্যের সারা বছরের জলের চাহিদা মেটায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফিনিসিয়ান (Phoenician), কারথাজিনিয়ান (Carthaginian) আমলে এবং ষষ্ঠ শতাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে, বাড়ির ছাদে পড়া বৃষ্টির জল চৌবাচ্চায় ধরে রাখা হত। এই জলই ছিল তাদের ব্যবহার্য জলের প্রধান

উৎস। ভেনিস-এ ষোড়শ শতাব্দ অব্দি বাড়ির ছাদে পড়া বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করা হত। এখানে বৃষ্টির জল সকল নাগরিকের ব্যবহারের জন্য ১৭৭টি বড় চৌবাচ্চা এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রায় আরও ১৯০০টি চৌবাচ্চা ছিল। এই সব চৌবাচ্চায় ৬৬৫,০০০ ঘন মিটার জল ধরা হত। ভেনিসের প্রতিটি নাগরিককে এখান থেকে রোজ মাথা পিছু ১৬ লিটার জল সরবরাহ করা হত।

থাইল্যান্ড-এ বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার অভ্যাসটি চালু আছে বিগত প্রায় ২০০০ বছর ধরে। তাছাড়াও, নদীর জলপ্রবাহ আটকে বাঁধ দিয়ে (dykes) জল ধরে ব্যবহার করার পদ্ধতি শুরু হয়েছিল প্রায় ৮০০ বছর আগে। ইন্দোনেশিয়া-য় কালিমান্তান অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভ দুটির জলই বেশ নোনা। এর ফলে সেখানে বেশ কয়েকশো বছর ধরেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়। ফিলিপাইনস এর বেশ কিছু অঞ্চলে মানুষের ঘর-গেরস্তালির কাজে এবং রোজকার দরকারে এখনও বৃষ্টির জল ধরে রেখেই ব্যবহার করা হয়। এখানকার মানুষের বিশ্বাস, নদীর জলের চেয়ে এটি ঢের নিরাপদ।

চিন দেশে বৃষ্টির জল মূলত ব্যবহার করা হয় চাষের জমিতে জলসেচের কাজে। কিছু অঞ্চলে অবশ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়ির ছাদে পড়া বৃষ্টির জল ধরে প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করা হয়। জাপান-এ বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের অভ্যাসটি সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের প্রতিটি বাড়ির একতলার ভিত-এ বৃষ্টির জল শোধিত অবস্থায় জলাধারে সংরক্ষণ করা হয়। জাপানের ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চলে ভূমিকম্পের সময় আগুন লাগলে, তা নেভাতে দমকল কর্মিরা এই ধরে রাখা বৃষ্টির জলের ওপরেই নির্ভর করে। কারণ তখন জল সরবরাহের স্বাভাবিক পরিষেবা ভেঙে পড়ে।

আফ্রিকায় ২০০০ বছর আগে থেকেই বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার অভ্যাস মানুষের আছে। খড়-ছাওয়া ঘরের চালে মুখ খোলা পাত্রে এই জল ধরা হয়।

নেপাল-এ জল সংরক্ষণের অভ্যাসটি দীর্ঘদিনের। দেশের প্রায় সর্বত্রই 'পোখরি' (পুকুর) দেখা যায়। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য বানানো পান্থশালার পাশে পাথর বাঁধানো পুকুর বা পোখরি-র সংখ্যাই বেশি। পোথরি-তে পাহাড়ি নদী ও বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয। এই জল গেরস্তালির কাজে এবং কৃষি ক্ষেতে জলসেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। পোখরি-র জল ভৌমজলস্তরকেও সমৃদ্ধ করে। নেপালের রামেছাপ জেলায় পাহাড়ের মাথায় চারণভূমিতে (স্থানীয় ভাষায় 'খারকাস') গবাদি পশুপালন এবং ছোট মাপের জমিতে জলসেচের জন্য এখনও গোষ্ঠী উদ্যোগে পোখরি তৈরি করা হয় বৃষ্টির জল সংরক্ষণেব. জন্য। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় মানুষের রোজকার কাজে, পানীয় জল হিসেবে এবং চাষের জমিতে সেচের জন্য, দীর্ঘকাল ধরে 'রাজকুলো' এবং 'ধুঞ্জ ধারাস' — এই দুই ধরণের নালা তাদের জলের প্রধান উৎস। 'রাজকুলো' তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দে। ললিতপুর জেলার রাজকুলো 'নাল্লু' ও 'লেলে' নদী থেকে বৃষ্টির নিকাশী জল বয়ে আনে কাঠমাণ্ডু উপত্যকার পাতাল শহরে। নেপালের পোরখা জেলায় 'ভীমসেন কুলো' তৈরি হয়েছিল উনিশ শতাব্দে। 'ধুঞ্জ ধারাস' প্রধানত ঝরনার কাছাকাছি গড়ে তোলা হয় বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য।

পাকিস্তান এর মরু অঞ্চলে প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম গর্তে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়।

এসব অঞ্চলে জলের একমাত্র উৎস এটিই। শ্রীলঙ্কা-য় গাছের পাতায়, গাছের কোটরে এবং পাথরের গভীর খাঁজে বা গর্তে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা হয়।

ত্রয়ী — মানুষ, জল সংরক্ষণ ও জলনীতি

ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান জলের ঘাটতি ও জল সংকট দুর করতে জল সংরক্ষণের অভ্যাসটিকে জাতীয় চেতনায় আনতে হবে। যে সব জায়গায় জল সংরক্ষণের পুরানো ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গেছে বা ভেঙে পড়ছে, সেগুলোকে মেরামত করে কার্যকরী করে তুলতে হবে। যেখানে জল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, সেখানে জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জল সংরক্ষণের পুরানো ব্যবস্থাগুলো ক্রমশ ভেঙে পড়ার বেশ কিছু কারণ থাকলেও দুটি কারণ বেশ স্পষ্ট। প্রথমত, শতাব্দ-প্রাচীন এই পদ্ধতিগুলোকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্য ও অনীহা; দ্বিতীয়ত, স্থানীয় মানব গোষ্ঠীরও জল সংরক্ষণের প্রাচীন ব্যবস্থাগুলো নিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা। বদলে, যন্ত্রশক্তি-চালিত ব্যবস্থায় ভূগর্ভ থেকে জল টেনে তোলার একমুখী ঝোঁক।

জল সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে ভারতের নীতি নির্ধারকরা এখনও উদ্ভাবনী কিছু ব্যবস্থা ভাবতে বা হাতে নিতে পারেননি। জল সমস্যা দুর করতে নানান বড় ও মেগা প্রকল্পই এঁদের ভরসা। ছোটর সঙ্গে বড়কে মেলানোর যে জরুরি ভাবনা, তা বেশির ভাগ সময়েই এঁদের মাথায় থাকে না। আর একটি জরুরি বিষয় যা প্রায়ই অনালোচিত থাকে, তা হল, মানুষের ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদার ন্যায্য ব্যবস্থাপনা। জলের চাহিদার যতক্ষণ পর্যন্ত সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা করা না যাবে, ছোট বা বড় কোন প্রকল্পই জল সংক্রান্ত কোন সমস্যা চিরতরে দুর করতে পারবে না। তাই রাষ্ট্রের পক্ষেও মানুষের ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটানো দিন দিন কঠিন হয়ে পড়বে। জল সংকট কাটাতে নাগরিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ জল নিয়ে সমাজে এক সার্বিক গণচেতনা গড়ে তুলতে হবে। সুষ্ঠ জল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এমন এক বিকেন্দ্রীভূত পরিবেশ সৃষ্টি এবং নীতি নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে মানব গোষ্ঠী এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মহাত্মা গান্ধির 'পঞ্চায়েতী রাজ' এর স্বপ্নকে সফল করতে হলে, প্রথমেই দেশ জুড়ে জল সংরক্ষণের কর্মসুচি হাতে নিতে হবে — 'হর গাঁও কা আপনা তালাব' (প্রতিটি গ্রামের নিজের জলাধার)। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কেবল পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর সুচনাপর্ব না, এটি গ্রামে কর্মসংস্থান গড়ে তুলে দারিদ্র দুর করতেও পারে। এর ফলে গ্রাম থেকে কাজের আশায় দলে দলে শহরে চলে আসার ঝোঁকও কমবে। প্রয়োজন মতো নিশ্চিত জলের জোগানের আশ্বাস পেলে গ্রামের মানুষ চাষবাসে এবং পশুপালনে আরও আগ্রহী হবে। আর কে না জানে গ্রামীণ অর্থনীতির এ দুটিই প্রধান অবলম্বন। প্রতিটি গ্রামে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠলেই সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা দেখা দেবে।

শুধু যে গ্রামের মানুষেরই জল সংরক্ষণ করা দরকার, তা কিন্তু না। জলের অব্যবস্থার দরুণ ভারতবর্ষের শহর ও নগরে জলের সমস্যা বেড়েই চলেছে। শহরের নিকাশী বর্জ্য

জলে সমস্ত নদী এবং ভৌমজলস্তর দূষিত। একদিকে এখানকার ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটাতে ভৌমজল এবং নদীর জলের পরিমাণ ক্রমশই কমছে; আবার অন্যদিকে, কিছুক্ষণ জোরে বৃষ্টি হলেই শহরগুলো জলে ডুবে যায়। এ দুটি সমস্যা দুর করতে দিন দিন বৃষ্টির জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টা বাড়াতেই হবে। বাড়ির ছাদে পড়া নির্মল বৃষ্টির জল সরাসরি ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে, বা ভৌমজলস্তরকে পুষ্ট করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছোট ও বড় শহর নির্বিশেষে জলাশয় বা পুকুরগুলো বর্জ্য ফেলার এক আস্তাকুঁড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলোর জল দূষিতই শুধু না, কেউ এগুলোকে পরিষ্কার করার ব্যাপারে খুব একটা মাথাও ঘামায় না। ক্রমশ বর্জ্যে ভর্তি হতে হতে এগুলোর আয়তন কমে আসে। তখন জমি-হাঙরদের নজর গিয়ে পড়ে এসব জলাশয়ের ওপর। অচিরেই গড়ে ওঠে বহুতল আবাসন বা শপিং মল।

অর্থনীতিবিদরা জলকে 'সামাজিক মূলধন' (Social capital) বলেছেন। এটি এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি মানব গোষ্ঠীকে একত্রিত করতে পারে। আবার, দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্নও করতে পারে। জল এমন এক সামাজিক পাটাতন, যার ওপর ভিত্তি করে সমাজে পরিবর্তন আসে, মানুষের উন্নতি হয়। এটি অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পুনর্গঠনেও (regeneration) সাহায্য করে। পুনরুজ্জীবিত বাস্তুতন্ত্র মানেই পুনরুজ্জীবিত অর্থনীতি। দেশের নারীস্বাস্থ্য এবং স্বাক্ষরতা হার জলের ওপর নির্ভরশীল। জল সংরক্ষণ বিষয়ক গোষ্ঠীচেতনা ও কর্মসূচি সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। ভবিষ্যতে এটি জল ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার করার বেশ কিছু সুযোগসুবিধাও রয়েছে। প্রথমত, এটি ভৌমজলস্তরের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে কুয়ো খুঁড়ে অনেকদিন ধরে জল ব্যবহার করা যায়। আবার যেখানে অতি পরিমাণে ভৌমজল ব্যবহার করার ফলে তা নোনা হয়ে পড়েছে, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার করা শুরু করলে, ভৌমজলে হাত না পড়ায়, পরোক্ষভাবে ক্রমশ ভৌমজলের নোনতা ভাব দুর হয়। যেখানে ভৌমজলে খুব বেশি লোহা নুন থাকায় তা হলদেটে হয়ে পড়েছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করলে, এই নুন ধুয়ে মাটির আরও নীচের স্তরে চলে যায়। ফলে জল পরিষ্কার হয়ে যায়। এমনকি প্রতিটি বাড়িতে এবং সমষ্টিগত ভাবে অন্য কোন জায়গায় বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারলে, নীচু জলা অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা অল্প হলেও খানিকটা কমানো যায়।

বর্তমানে মানুষ তার ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর জলভাণ্ডার থেকে যে পরিমাণ মিষ্টি জল পাচ্ছে, ২০০০ বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন বর্তমান জনসংখ্যার তিন শতাংশেরও কম ছিল, এই পরিমাণটা প্রায় একই ছিল। মানুষকে তাই জল ব্যবহারের ব্যাপারে অতি সতর্ক হতে হবে। দেখতে হবে বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার সকল নীতি ও কর্মসূচি যেন কেবলই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে মানুষকেন্দ্রিক হয়। সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আজকের দিনটাই শেষ না। আগামীকালও আছে। প্রকৃতি কিন্তু আর একটিও জল-অপব্যয়ী শতাব্দ সইতে পারবে না।

তথ্যসূত্র:

১. Anil Agarwal, Sunita Narayan and Indira Khurana (Ed.) – Making Water Everybody's Business – Practice And Policy Of Water Harvesting; Centre for Science and Environment, New Delhi, 2009.

২. Anon, Proceedings of the 8th International Confernce on Rainwater Catchment Systems, Vol 1 and 2, April, Teheran, Iran, 1997.

৩. Anon, Master Plan of Sukhohal Historical Park, Department of Fine Arts, Ministry of Education, Khoa Panish Press, Bangkok, 1978.

৪. B Latham and E Schiller, Rainwater collection systems: a literature review, in Proceedings of the 3rd InternationalConference on Rainwater Cistern Systems, Khon Kaen, Thailand, January, 1987.

৫. Binnie et al, Water Supply and Sewerage for Greater Kathmandu and Bhaktapur Work Plan, London, 1973.

৬. D Ray, Rainwater harvesting project: a selection of socioeconomic case studies, Report of ITDG, Vol 1, London, 1983.

৭. E Pakianathan, a study of division and delivery systems in rainwater catchment cisterns in India, in Proceedings of the 4th International Conference on Rainwater Cistern Systems, The Philippines, August, 1989.

৮. F M Crasta, C A Fasso, F Patta and G Putzu, Carthaginian-Roman cisterns in Sardinia, in Proceedings of the International Conference on Rainwater Cistern Systems, Honolulu, USA, June, 1982.

৯. G S Ongweny, Rainfall and stormwater harvesting for additional water supplies in Africa, in Proceedings of the 4th International Conference on Rainwater Cistern Systems, Manila, The Philippines, August 22-24, 1979.

১০. J E Gould, Preliminary report on rainwater catchment systems in Botswana, Gabarone Botswana Technology Centre, Botswana, mimeo, 1983.

১১. L Weiner, Rainwater cisterns in Israel's Negev desert – past and present development, in proceedings of the 3rd International Conference on Rainwater Cistern Systems, Khon Kaen, Thailand, January, 1987.

১২. M Whiteside, How to Build a Water Catchment Tank, Mahalapya Development Trust, Gabarone Government Printers, Botswana, 1982.

১৩. Reassessment Of Water Availability In India Using Space Inputs – Basin Planning And Management Organisation, Central Water Commission, New Delhi – 110066, June 2019.

১৪. Y S Fok et al, Bayes-Markov analysis for rain catchment systems, in Technical Report, Water Resources Research Centre, University of Hawaii, No 133, Honolulu, USA, 1980.